রাণা রাজসিংহ



ছোটদের রাজস্থান গ্রন্থমালা—দ্বাদশ গ্রন্থ

রাণা রাজসিংহ

"সার গুরুদাস", "রাজা সীতারাম", "দুনিয়ার আজব" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

জুন
১৯৭৫
৪

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

দাম—
টা· ১৫০

রাণা রাজসিংহ

এক

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মেবার তার স্বাধীনতা হারায়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মেবারের উপর দিয়ে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে। কতবার মেবার বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু সেই শিলাদিত্যের সময় থেকে মেবার কখনও কারুর কাছে নতি স্বীকার করে নি।

তাই শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর যখন তাঁর পুত্র খুর্‌রমকে পাঠিয়ে মেবার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হলেন, তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। হাতির পিঠে চড়ে সারা রাজধানী ঘুরে, প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা বিলি করে তিনি এই জয়ের আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। তবে মেবারের রাণা অমরসিংহের মর্যাদা তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নি। জাহাঙ্গীর মানীর মান রেখেছিলেন। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দিনলিপি রাখার অভ্যাস ছিল। দিনলিপিতে তিনি লিখেছিলেন, অমরসিংহ এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণ পূর্বে কখনও হিন্দুস্থানের কোন রাজাকে দর্শন করেন নি। কখনও তাঁরা কোন রাজার বশ্যতা স্বীকার করেন নি। অতএব যে সৌভাগ্য আমার জীবনে এল, আমি তা হারাতে চাই নি। আমি সঙ্গে সঙ্গেই আমার পুত্রকে জানিয়ে দিলাম যে, আমি রাণাকে ক্ষমা করেছি। এই মর্মে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ফরমানও পাঠিয়ে দিলাম যে, এখন থেকে রাণা আমার আশ্রয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। জাহাঙ্গীর রাণা অমরসিংহের পুত্র কর্ণসিংহকে মোগল দরবারে পাঁচহাজারী মনসবদার নিযুক্ত করেছিলেন।

এর পরের কাহিনী জাহাঙ্গীরের নিজের কথা থেকেই জানা যাক ঃ

মহরম মাস। ২৪ তারিখ। আমার রাজত্বলাভের দশম বৎসর। দরবারে কর্ণসিংহের পুত্র জগৎসিংহ এসেছে। জগৎসিংহ আমার প্রতি যথাবিহিত শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার পিতা এবং পিতামহ রাণা অমরসিংহের আর্জি পেশ করেছে। জগৎসিংহের চেহারায় তার পূর্বপুরুষদের আভিজাত্যের পরিচয় রয়েছে। আমি তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছিলাম এবং উপঢৌকন দিয়েছিলাম।

শাবান মাস। ১০ তারিখ। জগৎসিংহকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হল। প্রত্যাবর্তনের সময় আমি তাকে কুড়ি হাজার টাকা, একটি ঘোড়া, হাতি এবং খেলাত (সম্মানসূচক পোশাক) উপহার দিলাম।

রবি আউল আকবর মাস। ২৮ তারিখ। রাণা এবং কর্ণের শ্বেতপাথরে নির্মিত মূর্তি আগ্রার বাগানে স্থাপনের নির্দেশ দিলাম।

আমার রাজত্বের একাদশ বৎসরে ইত্তেমাদ খানের নিকট হতে আর্জি পেলাম। ইত্তেমাদ খান আর্জিতে জানিয়েছে যে, সুলতান খুর্‌রম্ রাণার দেশে উপস্থিত হয়েছে। যুবরাজ এবং তাঁর পুত্রের সঙ্গে আমার পুত্রের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। সাক্ষাৎকালে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ খুর্‌রম্‌কে সাতটি হাতি, জিন্ সমেত সাতাশটি ঘোড়া, মণি-রত্নের কয়েকটি ডালি এবং স্বর্ণালঙ্কার উপঢৌকন দেওয়া হয়। এর থেকে খুর্‌রম্ তিনটি ঘোড়া নিয়ে আর সব ফিরিয়ে দেয়। স্থির হয় যে, যুদ্ধকালে যুবরাজ কর্ণ পনের শত রাজপুত অশ্বারোহীসহ খুর্‌রমের সঙ্গে থাকবে।

আমার রাজত্বলাভের ত্রয়োদশ বৎসরে যুবরাজ কর্ণ দরবারে এসেছিল। সেখান থেকে সে সিন্দলাতে যুদ্ধজয়ের জন্য আমাকে অভিনন্দন জানাতে যায়। কর্ণ আমাকে একশত মোহর, এক হাজার টাকা, নজরানা, একুশ হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও মণিমুক্তাখচিত অলংকার, শক্তিশালী হাতি ও ঘোড়া উপঢৌকন দেয়। হাতি ও

ঘোড়া ফেরৎ দিয়ে আর সবই আমি গ্রহণ করি। পরের দিন আমি তাকে খেলাত উপহার দিলাম। ফতেপুরে আমি তাকে বিদায় দিলাম। যাবার সময় আমি তাকে হাতি, ঘোড়া, তলোয়ার, ছোরা এবং তার পিতৃদেবের জন্য একটি ঘোড়া উপহার দিলাম।

রবি আউল মাস। ১৭ তারিখ। ১০২৯ হিজরি সাল। আমার রাজত্বলাভের চতুর্দশ বৎসরে রাণা অমরসিংহের মৃত্যু সংবাদ পেলাম। দরবারে তাঁর দৌহিত্র জগৎসিংহ এবং তাঁর পুত্র ভীমসিংহ উপস্থিত ছিল। তাদের খেলাত দিলাম এবং রাজা কিশোরীদাসকে যুবরাজ কর্ণের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। রাজা কিশোরীদাসের সঙ্গে যুবরাজ কর্ণকে রাণা পদে অধিষ্ঠিত করার ফরমান, রাণা পদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধার অনুজ্ঞা, কয়েকটি বাছাই করা ঘোড়া এবং যুবরাজ কর্ণের নিকট লিখিত একটি সময়োচিত শোকবার্তা পাঠিয়েছিলাম।

একজন রাজপুত রাজার সঙ্গে ফরমান ও শোকবার্তা পাঠিয়ে জাহাঙ্গীর মেবারের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনই করেছিলেন।

১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণসিংহ মেবারের সিংহাসনে উপবেশন করেন। মেবার তখন আর স্বাধীন রাজ্য নয়, বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের একটি জায়গীর মাত্র। তথাপি সাহসে, শৌর্যে, আচার-আচরণে কর্ণসিংহ পূর্বপুরুষদের রক্তধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধে মেবারের রাজকোষ যখন শূন্য হয়ে গেছে, রাণা অমরসিংহ যখন অর্থের অভাবে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন, তখন কর্ণসিংহ বিদ্যুৎগতিতে শত্রুর প্রতিরোধ ভেঙে সুরাট থেকে অর্থসংগ্রহ করে এনেছেন। প্রায় আট বৎসর কাল তিনি রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে মেবারবাসীরা শান্তি ও স্বস্তিতে বাস করেছিল। এই অবকাশে কর্ণসিংহ কয়েকটি গঠনমূলক কাজ করেন। তিনি রাজধানী উদয়পুর সুরক্ষিত করার জন্য প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেন এবং পরিখা খনন করেন। সারা বছর পেশোলা হ্রদের জল ধরে রাখার জন্য বড়

করে বাঁধ নির্মাণ করেন। অন্তঃপুরের মহিলাদের জন্য রাবালা প্রাসাদ নির্মিত হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে মেবার বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিল। রাণা কর্ণসিংহের ভ্রাতা ভীমসিংহ দরবারে মেবারের প্রতিনিধিত্ব করতেন। নিজ গুণে ভীমসিংহ সম্রাটের পুত্র খুর্‌রমের বন্ধু ও প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিলেন। খুর্‌রমের আবেদনে জাহাঙ্গীর ভীমসিংহকে রাজা উপাধি দান করেন এবং বুনাস নদীর তীরে ভীমসিংহের জন্য একটি ক্ষুদ্র জায়গীরের ব্যবস্থা করে দেন। থোডা ভীমসিংহের রাজধানী হয়।

ভীমসিংহ খুর্‌রমের মনের কথা জানতেন। তিনি খুর্‌রমের মতি-গতির খবর রাখতেন। জাহাঙ্গীরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও তাঁর অজানা ছিল না। খুর্‌রমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন পরভেজ। অতএব জাহাঙ্গীরের পর পরভেজেরই সম্রাট হওয়ার কথা। কিন্তু খুর্‌রম্ মনের নিভৃত কোণে পিতা জাহাঙ্গীরের পর মোগল সিংহাসনে আরোহণ করার আশা পোষণ করতেন। খুর্‌রমের মনের এই গোপন ইচ্ছার কথা ভীমসিংহ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি এই ইচ্ছাকে নিয়ত জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন। খুর্‌রমের মা ছিলেন মারবারের রাজকুমারী। সেই হিসেবে খুর্‌রম্, যিনি পরবর্তীকালে শাহ্‌জাহান নামে বিখ্যাত হন, তিনি মাতার দিক থেকে দেহে রাজপুত হিন্দু রক্তধারাও বহন করতেন। ভীমসিংহ খুর্‌রমের জন্য সিংহাসন প্রাপ্তির চক্রান্তে খুর্‌রমের মাতামহ মারবার-রাজকেও লিপ্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য সে চেষ্টা তাঁর সফল হয় নি।

সিংহাসন দখলের খেলায় খুর্‌রম্ এবং ভীমসিংহ খুব সাবধানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর মিশ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর দয়ারও অন্ত ছিল না, নৃশংসতাও ছিল সীমাহীন। বহুকাল পূর্বে জাহাঙ্গীরের আর এক পুত্র খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর সে চক্রান্তের কথা জানতে পেরে খসরুকে প্রায় অন্ধ করে দেন। খসরুর সাহায্যকারী দুই সেনানায়কদের একজনকে ষাঁড় কেটে তার চামড়ার মধ্যে পুরে এবং অপরজনকে একটি গাধা কেটে তার চামড়ার মধ্যে পুরে চামড়া সেলাই করে সারা আগ্রা নগরী ঘোরান হয়। শেষ পর্যন্ত খসরুকে খুন করা হয়েছিল। এ সব ঘটনা অবশ্য অনেক আগের—সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের শেষ দিকের কথা।

এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। জাহাঙ্গীরের বয়েস হয়েছে। তার উপর অবিরাম আফিমের নেশা করতে করতে তাঁর কর্মক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে মোগল শাসন ক্ষমতা এখন জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী নূরজাহানের হাতে। জাহাঙ্গীরের নামে পিছন থেকে নূরজাহানই তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। এই দরবারের মান্যগণ্য আমীর-ওমরাহগণও বিরক্ত ও বিব্রত হচ্ছেন। ভীমসিংহ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইলেন।

নেশাগ্রস্ত হলেও জাহাঙ্গীর মোগল সম্রাট। খুর্‌রম্ এবং ভীমসিংহের বন্ধুত্ব যে সবটাই নির্দোষ নয় এমন একটা সন্দেহ তাঁর মনে এসেছিল। জাহাঙ্গীর একজনকে অপরজনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি ভীমসিংহকে গুজরাট যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এমন একটা সময় আসে যখন চক্রান্তকারীরা তাদের মুখোশ খুলে ফেলে ঘটনার মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়। ভীম সিংহকে গুজরাট যাত্রার নির্দেশ ভীমসিংহের জীবনে সেই সময় নিয়ে এল।

ভীমসিংহ মুখোশ খুলে ফেললেন। তিনি সম্রাটের নির্দেশ অমান্য করলেন। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, তিনি গুজরাট যাবেন না। ভীমসিংহ খুর্‌রম্‌কেও বুদ্ধি দিলেন যে, যদি সম্রাট হতে হয়, তবে এই শেষ সুযোগ। নিশ্চেষ্ট না থেকে খুর্‌রম্‌কে প্রকাশ্য বিদ্রোহের পথে যেতে হবে।

খুর্‌রমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরভেজ জাহাঙ্গীরের ফরমান নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে হত্যা করা হল। এই হত্যার মধ্য দিয়ে খুর্‌রম্ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথই গ্রহণ করলেন।

জাহাঙ্গীর বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাদল পাঠালেন। যুদ্ধে ভীমসিংহ নিহত হলেন। খুর্‌রম্ বিদ্রোহী সঙ্গীদের নিয়ে উদয়পুর প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন। কিছুকাল উদয়পুর প্রাসাদে থেকে তিনি প্রাণ বাঁচাবার জন্য দূরে কোথাও চলে গেলেন।

উদয়পুর প্রাসাদে খুর্‌রমের আশ্রয় গ্রহণের কথা জাহাঙ্গীর জানতে পেরেছিলেন। তথাপি তিনি রাণা কর্ণসিংহের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি বা তাঁকে কখনও শত্রু মনে করেন নি। কারণ জাহাঙ্গীর জানতেন যে, এই বিদ্রোহে রাণা কর্ণসিংহের কোন ভূমিকাই ছিল না।

১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণসিংহের মৃত্যু হয়। এর অল্প কিছুদিন পরই সম্রাট জাহাঙ্গীরও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। কর্ণসিংহের পর মেবারের রাণা হন তাঁর পুত্র জগৎসিংহ। জাহাঙ্গীরের মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরে খুর্‌রম্ নির্বাসিত জীবন থেকে উদয়পুরে চলে এলেন। উদয়পুরের বাদল মহল প্রাসাদেই খুর্‌রম্ শাহ্‌জাহান নাম গ্রহণ করেছিলেন।

জগৎসিংহ ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর শাসনকাল শান্তিতেই অতিবাহিত হয়। জগৎসিংহের রাজত্বকাল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কীর্তির জন্য বিখ্যাত। তিনি মেবারের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন রাজধানী চিতোরের ভগ্নপ্রায় দুর্গ, মন্দির, প্রাসাদ ইত্যাদির সংস্কার সাধন করেন। মেবারের ভাটগণ ছাড়াও সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এবং ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণ জগৎসিংহের রাজত্বকালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

জগৎসিংহ মারবীরের রাজকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহের ফলে দুই পুত্রের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাজসিংহ।

জগৎসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজসিংহ মেবারের রাণা হন।

মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহান তখন বৃদ্ধ হয়েছেন।

সে-সময় ভারতের সিংহাসন নিয়ে একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটেছিল। সে কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন শাহ্‌জাহানের ছেলেরা। সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের চার ছেলে,—দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। আওরঙ্গজেবের দ্বারাই প্রধানত সে প্রলয়কাণ্ড ঘটেছিল।

শাহ্‌জাহান বৃদ্ধ ও রুগ্ন। তাঁর ইচ্ছা, তিনি বড় ছেলে দারাকেই ভারতের সিংহাসন দিয়ে যান। কিন্তু আওরঙ্গজেবের তা মোটেই ভাল লাগলো না; তাঁর ইচ্ছা, তিনিই ভারত-সম্রাট্ হন। আবার সুজা এবং মুরাদেরও ইচ্ছা, তাঁরাই সিংহাসনটি পান। এই নিয়ে চার ভাইএর মধ্যে একটি ভীষণ শত্রুতা আরম্ভ হলো। এই শত্রুতায় শেষপর্যন্ত যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো।

চার ভাই প্রত্যেকেই রাণা রাজসিংহকে তাঁদের সাহায্য করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাজসিংহ দেখলেন, দারা একে তো সম্রাটের বড় ছেলে; তার উপর তিনি বিদ্বান্, গুণবান্, ধার্মিক এবং হিন্দুদের পরম বন্ধু,—মোটের উপর ভারতের সম্রাট্ হতে হ'লে যে-সব গুণের দরকার, দারা প্রায় সে সবগুলিরই অধিকারী। তাই তিনি সৈন্য নিয়ে দারার পক্ষেই আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত জয়ী হতে পারলেন না, ফতেহাবাদের যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তিনি হেরে গেলেন।

আওরঙ্গজেব ভাইদের—এমন কি, নিজের ছেলের রক্তে হাত রাঙিয়ে, বৃদ্ধ পিতাকে কারাগারে বন্দী ক'রে দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন।

দুই

আওরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া মুসলমান। নিজ ধর্মের প্রতি তাঁর অচল নিষ্ঠা ছিল। হিন্দুধর্মের উপর তাঁর বিদ্বেষ ছিল ভয়ানক। তিনি নানাভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতেন। হিন্দুদের বহু দেবমন্দির চূর্ণ ক'রে তিনি সেখানে সেই মালমসলা দিয়ে মসজিদ্ তৈরী করেছিলেন। বহু হিন্দু তাঁর অত্যাচারে মুসলমান হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের আর একটি দোষ ছিল, তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না; যে তাঁকে পরম বন্ধু ব'লে মনে করতো, তিনি তাকেও ঘোর অবিশ্বাসের চোখে দেখতেন।

রাণা রাজসিংহ হিন্দুধর্মের ওপর অত্যাচারের জন্য আওরঙ্গজেবের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। কিন্তু তাঁর শক্তি সামান্য; সেই সামান্য শক্তি নিয়ে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, আর বালির বাঁধ দিয়ে সাগরের স্রোতকে বাধা দিতে যাওয়া একই কথা! তাই তিনি রাজপুতনার সমস্ত রাজপুত-রাজাদের একত্র ক'রে আওরঙ্গজেবকে শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করলেন।

রাজসিংহ যখন রাজপুত-রাজাদের একত্র ক'রে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধ করবার আয়োজন করছিলেন, ঠিক সেইসময় এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যাতে রাজসিংহ বেশ বড় একটা সুযোগ লাভ করলেন।

মোগলের অধীনে ছোট একটা রাজ্য ছিল, তার নাম—রূপনগর। রাঠোরবংশের একজন রাজা সে-রাজ্যের মালিক। তাঁর নাম, বিক্রম শোলাঙ্কী। প্রভাবতী তাঁর মেয়ে।

প্রভাবতী পরমাসুন্দরী। তাঁর সেই রূপের কথা আওরঙ্গজেব শুনলেন। শুনেই প্রভাবতীকে বিয়ে করবার তাঁর খুব লোভ হলো। তিনি মনে করলেন, বিক্রম শোলাঙ্কী তাঁর অধীনে সামান্য একজন করদ

রাজা, আর তিনি ভারত সম্রাট্ আওরঙ্গজেব···চাইবামাত্রই বিক্রম শোলাঙ্কী ভয়ে ভয়ে তাঁর মেয়েকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসে দিল্লীতে পৌঁছে যাবেন। আর, প্রভাবতী? ভারত সম্রাটের বেগম হওয়ার যে পরম গৌরব—তা কয়জন রমণীর ভাগ্যে ঘটে? প্রভাবতী এতে পরম আহ্লাদেই সম্মত হবেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব বুঝতে পারেননি যে, হিন্দুনারী তার ধর্মকে ভারতের মণিরত্নখচিত সিংহাসনের চাইতেও অনেক বেশী বড় ব'লে মনে ক'রে থাকে। ধর্মের বিনিময়ে স্বর্গলাভ করাকেও সে তুচ্ছ ব'লে মনে করে।

আওরঙ্গজেব তুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে, বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন রূপনগরের রাজার কাছে। তারা খুব আড়ম্বর ক'রে বহু উপহার নিয়ে রূপনগরে গিয়ে, বিক্রম শোলাঙ্কীকে সম্রাটের আদেশ জানালো।

বৃদ্ধ রাজা ভয়ে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লেন। একদিকে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের আদেশ, সে-আদেশের বিরুদ্ধে কথা বলে, ভারতে এমন রাজা কয়জন আছে? তিনি ত' অতি ক্ষুদ্র! যে তুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এসেছে, তারাই রূপনগরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিয়ে যেতে পারে—আর একদিকে সমাজের ভয়, জাতের ভয়। এর আগে কোনো কোনো রাজপুত-রাজা, মোগল বাদশাহের সঙ্গে তাঁদের মেয়ে, বা বোনের বিয়ে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু সেজন্য সমাজের কাছে তাঁরা মুখ হারিয়েছেন। বৃদ্ধ রাজা ভাবতে-ভাবতে অস্থির হয়ে উঠলেন, কি জবাব দেবেন তিনি সম্রাট্কে?

প্রভাবতী তখন নিতান্ত ছোট নন, তিনি পিতার বিপদ্ ভালো ভাবেই বুঝতে পারলেন। পিতার এমন শক্তি ও সাধ্য নাই যে, তিনি আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন। পিতার রাজ্য রক্ষা করতে হ'লে নিজেকে আওরঙ্গজেবের হাতে সঁপে দিতে হয়; কিন্তু সে-কথা মনে হতেই ঘৃণায় তাঁর সমস্ত মনটা ভ'রে উঠলো। অথচ আত্মরক্ষার



"সেটা কি উপায় মা।"

কোনো উপায় নাই ; আওরঙ্গজেবের যে শক্তি, তাতে তিনি অনায়াসে প্রভাবতীকে রূপনগর থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারেন। তবে কি এ বিপদ্ থেকে কোনোমতেই ধর্মরক্ষার উপায় নাই ? আছে,—মৃত্যু।

রাজপুতের মেয়ে তিনি, মরণকে তিনি ভয় করেন না। রাজপুতের মেয়েরা হাসতে হাসতে মরণের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে—এ-প্রথা ত' চিরদিন থেকে চলে আসছে, তবে আর ভাবনা কি ?

প্রভাবতীর চোখের সামনে যেন এক নতুন রাস্তা খুলে গেল ! তাঁর কেবলই মনে হতে লাগলো,—বিষ আছে, আগুন আছে, ছুরি আছে··· আওরঙ্গজেবের সাধ্য কি তাঁকে পায় ?

প্রভাবতী পিতাকে বোঝালেন, কোনো চিন্তা নাই, তাঁর কুলেও কলঙ্ক পড়বে না, রাজ্যও ঠিক থাকবে, সম্রাট্ও অসন্তুষ্ট হবেন না।

কন্যার কথায় আশ্বস্ত হয়ে পিতা জিজ্ঞেস করলেন,—সেটা কি উপায়, মা ?

মেয়ে হাসিমুখে গর্বভরে উত্তর করলেন,—সে অনেক পথ আছে বাবা,—বিষ···আগুন···ছুরি···

বাপের বড় আদরের মেয়ে প্রভাবতী। তাঁর মুখে ওকথা শুনে বৃদ্ধের বুকের নীচে যেন একটা ভূমিকম্প আরম্ভ হলো, চোখের জলে বুক ভেসে গেল। তিনি মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে শুধু কাঁদতে লাগলেন, আর কোনো কথা বলতে পারলেন না।

তিন

প্রভাবতী নিজের জীবন বিসর্জনের আয়োজন করতে লাগলেন। হঠাৎ এম্‌নি সময় তাঁর মনে হলো, রাজস্থানে কি এমন কেউ বীর নেই, যিনি আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রে তাঁর জীবন ও ধর্ম এবং পিতার রাজ্য রক্ষা করতে পারেন ?

সহসা মনে পড়লো তাঁর মেবারের রাণা রাজসিংহের কথা। তিনি বীর, স্বজাতিবৎসল, ভারতে আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর হৃদয়ে প্রবল ; বিশেষতঃ, আওরঙ্গজেবের উপর তাঁর বিদ্বেষ অত্যন্ত বেশী। তিনি কি এই বিপন্না রাজপুত-বালার ধর্মরক্ষার সহায় হবেন না ?

রাণা রাজসিংহকে প্রভাবতী তখনই এক চিঠি লিখলেন,—মহারাণা! রূপনগরের রাজকুমারী প্রভাবতী আমি বড় বিপদে প'ড়ে আজ আপনাকে এই চিঠি লিখছি। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব আমাকে বিয়ে করবার জন্য উন্মাদ হয়ে দু-হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পিতা মোগলের অধীন একজন ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা, তাঁর সাধ্য নাই যে প্রবল পরাক্রমশালী আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে আমায় রক্ষা করেন। আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবার সাহস ও ক্ষমতা রাজস্থানে একমাত্র আপনারই আছে ; তাই আজ এই বিপদে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আশা করি, একজন অসহায়া রমণীকে এ বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করতে আপনার তরবারি নিশ্চেষ্ট থাকবে না।

আপনার মত একজন বীর রাজস্থানে থাকতে যদি একজন রাজপুত-কুমারীকে মুসলমানের হাতে ধর্ম বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে সে লজ্জা কেবল আপনার নয়, তা সমস্ত রাজপুত জাতির। আপনার কাছে আমি জীবন-ভিক্ষা চাইছি। আপনি আমায় সাহায্য না করলেও আওরঙ্গজেব আমার ধর্ম নষ্ট করতে পারবেন না। আত্মহত্যা করেও আমি আমার ধর্ম রক্ষা করব সঙ্কল্প করেছি। তাই আপনার কাছে আমার জীবন-ভিক্ষা চাইছি।

আপনি যদি আমায় উদ্ধার করতে না আসেন, তবে জানবো—রাণা রাজসিংহের বাহু নিতান্ত দুর্বল ; একটা বিপন্না বালিকাকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে উদ্ধার করবার মত শক্তি সে-হাতে নাই,—এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে শেষে আমি আমার শেষ উপায় অবলম্বন করবো।

চিঠিখানা শেষ ক'রে প্রভাবতী ভাবতে লাগলেন, কাকে দিয়ে এই চিঠি রাজসিংহের কাছে পাঠাবেন? এমন রিশ্বাসী লোক কে আছে?

শেষে তাঁর মনে হলো, তাঁদের বাড়ীর বৃদ্ধ পুরোহিতের কথা। পুরোহিতঠাকুর তাঁকে বড় ভালোবাসেন। এ-বিপদে তিনি নিশ্চয়ই তাঁকে সাহায্য করবেন। তিনি খুব বিশ্বাসী, তাঁকে চিঠি দিয়ে রাজসিংহের কাছে পাঠালে, ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারবে না।

পুরোহিত পূজা শেষ ক'রে সবেমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছেন, এম্‌নি সময় প্রভাবতী গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে বললেন, "দাছু, এ-বিপদে আপনি আমায় রক্ষা করুন।"

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি প্রভাবতীকে ধ'রে তুলে তাঁর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, "আমার কি সাধ্য আছে দিদিমণি? যদি থাকে বলো, আমি প্রাণ দিয়েও তা করবো,—এই মা ভবানীর সামনে প্রতিজ্ঞা ক'রে বলছি।"

রাজকুমারী ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অত-বড় একটা আশ্বাস পেয়ে অতি লজ্জিতভাবে ধীরে-ধীরে বললেন, "আপনাকে আমি মুসলমানদের সঙ্গে আমার জন্য লড়তে পাঠাচ্ছি না, দাছু! আপনাকে শুধু একখানা চিঠি নিয়ে মেবারের রাণা রাজসিংহের কাছে যেতে হবে। কিন্তু খুব গোপনে···এমন কি, বাবা পর্যন্ত যেন কিছু টের না পান।"

পুরোহিত হেসে বললেন, "এই কাজ দিদিমণি! আমি মনে করেছিলুম বুঝি, আওরঙ্গজেবের মাথাটা কেটে আনতে হবে। তা' এর জন্যে তুমি ভাবছো? কই,—দাও চিঠি!"

প্রভাবতী বুকের জামার ভিতর থেকে চিঠিখানা বার ক'রে ঠাকুরের হাতে দিতে দিতে আবার বললে, "খুব সাবধান দাছু,—আর-কেউ যেন না জানে যে, আমি রাণা রাজসিংহকে আমার উদ্ধারের জন্য লিখে পাঠাচ্ছি।"

আনন্দের হাসিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। "কিছু ভেবো না দিদিমণি"—এই ব'লে চিঠিখানা নিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজসিংহের কাছে ছুটলেন।

চার

রাজসিংহ অনেকদিন থেকেই আওরঙ্গজেবের ওপর রাগে মনে-মনে জ্বল্‌ছিলেন—তাঁর নানারকম অত্যাচার ও উৎপাতের জন্য। এবার রাজকুমারীর পত্র পেয়ে তিনি আর নীরবে থাকতে পারলেন না। তাঁর ক্রোধের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। ধর্মরক্ষার জন্য রাজপুত বালিকার এই ব্যাকুল অনুরোধ তিনি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারলেন না। বাপ্পারাও, হামীর, সংগ্রামসিংহ ও প্রতাপসিংহের বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে তিনি কোন্ প্রাণে সে অনুরোধ উপেক্ষা করবেন?

রাজসিংহ তৎক্ষণাৎ সৈন্য নিয়ে প্রভাবতীকে উদ্ধার করবার জন্য রূপনগরের দিকে যাত্রা করলেন।

আরাবল্লী-পাহাড়ের নিকটেই রূপনগর রাজ্য। মোগল-সৈন্যেরা পাহাড়ের নীচেই তাঁবু ফেলেছে। তাদের আনন্দের সীমা নাই, রূপনগরের রাজকুমারীর সঙ্গে বাদশার বিয়ে হবে, সে বিয়েতে কত আমোদ-প্রমোদ হবে! তারা নিমন্ত্রণ ত' খাবেই, তাছাড়া পুরস্কারও পাবে প্রচুর।

মোগল-সৈন্যেরা সুখের কল্পনায় বিভোর হয়ে আছে, এম্‌নি সময়ে হঠাৎ একদিন রাজপুত-সৈন্যের 'হর-হর বম্-বম্' এবং বন্দুকের শব্দে তাদের বুক কেঁপে উঠলো। রাজসিংহের এ আক্রমণ তাদের কাছে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত মনে হলো! কারণ, তারা ভাবতেই পারেনি যে, এমন মূর্খও রাজস্থানে কেউ থাকতে পারে, যে সাধ ক'রে কখনো প্রবলপরাক্রান্ত মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়!

মোগল-সৈন্য দু'হাজার, আর রাণা রাজসিংহের সৈন্য তার তুলনায় ঢের কম! মোগলেরা মনে করলো, ঐ সামান্য কয়জন রাজপুত-সৈন্য তাদের তলোয়ারের চক্‌মকি দেখেই ভয়ে পালিয়ে যাবে, যুদ্ধ আর করতে হবে না। কিন্তু তারা যখন সিংহের মত তাদের উপর লাফিয়ে পড়লো, তখন তারা বিশ্ব-সংসার অন্ধকার দেখতে লাগলো।

অনেকক্ষণ ধ'রে হিন্দু-মুসলমানে যুদ্ধ হলো। মোগল-সৈন্য সংখ্যায় অনেক বেশী হলেও রাজপুতদের সঙ্গে পেরে উঠলো না। সামান্য কয়েকজন মোগল সে-যুদ্ধে কোনোরকমে আত্মরক্ষা ক'রে পালিয়ে গেল, বাকী সব রাণা রাজসিংহের পরাক্রমে দগ্ধ হয়ে গেল।

প্রভাবতীর পিতা যেন একটা মস্ত-বড় বিপদ্ থেকে উদ্ধার পেলেন! রাজসিংহ সেই বিপদের রক্ষাকর্তা ব'লে, বৃদ্ধরাজা তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে, তাঁরই হাতে প্রভাবতীকে সম্প্রদান করলেন।

রাণা রাজসিংহ প্রভাবতীকে নিয়ে বিজয়গৌরবে উদয়পুরে ফিরে এলেন।

পাঁচ

আওরঙ্গজেব নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন, রূপনগরের রাজা তাঁর মেয়ে প্রভাবতীকে নিশ্চয়ই মোগল-সম্রাটের ভয়ে তাঁর হাতে সমর্পণ করবেন; কিন্তু যখন শুনলেন, রাণা রাজসিংহ সম্রাটের দুই হাজার সৈন্যকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে প্রভাবতীকে নিয়ে চলে গেছেন, তখন রাগে তিনি জ্বলে উঠ্‌লেন, কিন্তু প্রকাশ্যে তখন কিছু করলেন না, ভবিষ্যতের জন্য তা' সঞ্চিত রয়ে গেল।

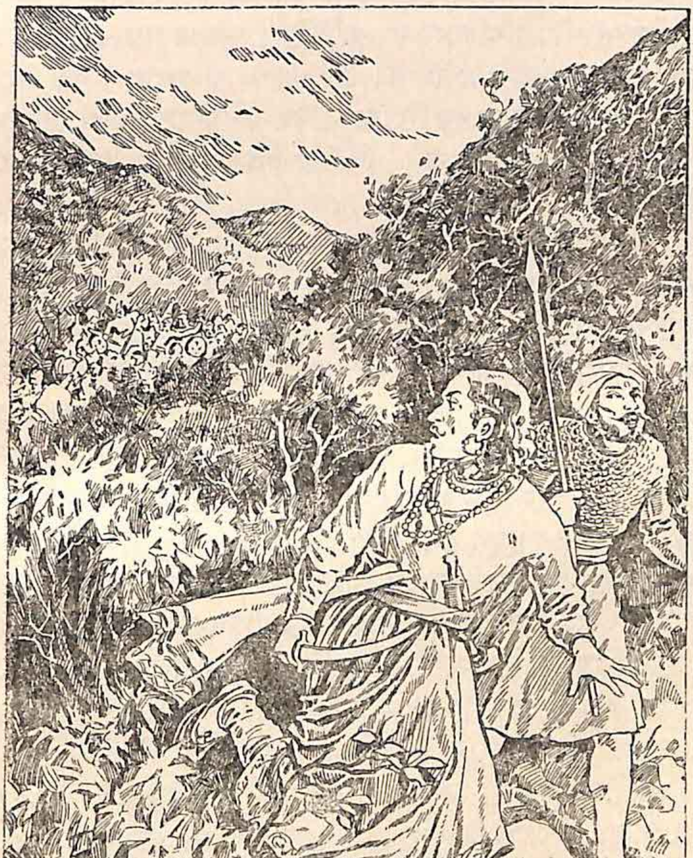
আওরঙ্গজেব এই সময় আর একটা জঘন্য কাজ ক'রে ফেললেন। সেটা হচ্ছে, মারবার-রাজ যশোবন্ত সিংহের হত্যা।

যশোবন্ত সিংহ আওরঙ্গজেবের বেতনভোগী সেনাপতি। মোগলের

পক্ষে তিনি বহু যুদ্ধ ক'রে বহু দেশ জয় করেছেন। কিন্তু তিনি কর্মচারী হলেও, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কোনো অন্যায় কার্যের প্রশ্রয় দিতেন না। আওরঙ্গজেব মনে করতেন—তিনি সম্রাট্, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, তিনি যা আদেশ করবেন তাঁর কর্মচারীরা তা অনবত মস্তকে পালন করবে···কিন্তু মহারাজ যশোবন্ত সিংহ সে-রকম কর্মচারী ছিলেন না, চাকরির জন্য তিনি কখনো বিবেক বলি দেননি। অনেক সময় তিনি আওরঙ্গজেবকে তাঁর অন্যায় কাজের জন্য তিরস্কার করতেও ছাড়তেন না। এইজন্য আওরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহের ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা ছিলেন, কিন্তু মুখে কখনো তা প্রকাশ করতেন না। গোপনে তিনি তাঁকে একেবারে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে ফেলবারই সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তা করতে গেলে ভয়ঙ্কর একটা গোলমালের সৃষ্টি হবে,—রাজ্যসুদ্ধ লোক হয়তো ক্ষেপে উঠবে! তাই তিনি এক কৌশল করলেন।

কাবুলে বিদ্রোহ উপস্থিত হ'লে বিদ্রোহ দমন করবার জন্য আওরঙ্গজেব সেখানে যশোবন্ত সিংহকে পাঠিয়ে দেন। সেইখানেই আওরঙ্গজেবের চক্রান্তে তাঁকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়। কিন্তু তাঁকে মেরে ফেলেও আওরঙ্গজেবের মনের ক্ষোভ মিটলো না, তিনি যশোবন্তের নাবালক-পুত্র অজিৎসিংহকে কয়েদ ক'রে তাঁর রাজ্য কেড়ে নেবার আয়োজন করলেন।

যশোবন্তের রাণী এই বিপদে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন; স্বামী গেলেন, পুত্রের জীবন এবং রাজ্যও বুঝি এবার যায়! অথচ ভারতে একমাত্র শিবাজী ছাড়া এমন কোন হিন্দু রাজা নাই, এবিপদে তিনি যাঁর সাহায্য পেতে পারেন। রাজসিংহের বীরত্বের কথা তিনি শুনেছিলেন। রাজসিংহ আওরঙ্গজেবের ঘোর বিরোধী, তিনি হিন্দুর সম্মান এবং স্বার্থরক্ষায় যত্নশীল, তাই যশোবন্তের রাণী তাঁকে এই বিপদের কথা জানিয়ে আওরঙ্গজেবের গ্রাস থেকে শিশুপুত্র অজিৎ এবং তাঁর রাজ্য রক্ষার প্রার্থনা করলেন।



অজিৎসিংহ পাহাড়ের অন্য পথ ধ'রে…

রাণা রাজসিংহ আওরঙ্গজেবের সেই নিষ্ঠুরতার কথা শুনে রাগে জ্বলে উঠ্‌লেন। তিনি জানতেন এবার আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে গেলে তিনি নিশ্চয়ই নীরবে থাকবেন না, প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য মোগল এসে মেবার ছেয়ে ফেলবে, মোগলের সে আক্রমণে হয়তো মেবার উচ্ছন্ন যাবে! তবু তিনি যশোবন্ত সিংহের রাণীর এ-বিপদে তাঁকে সাহায্য না ক'রে থাকতে পারলেন না। তিনি অজিৎসিংহকে সাদরে মেবারে আহ্বান করলেন।

অজিৎসিংহ দুশো মাত্র রাঠোর-সৈন্য নিয়ে মেবারের দিকে যাত্রা করলেন। আওরঙ্গজেব গুপ্তচরের মুখে এ-সংবাদ পেয়ে তাঁর গতিরোধ করবার জন্য পাঁচ হাজার মোগল-সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। অজিৎসিংহ যখন আরাবল্লী-পাহাড়ের গোপন-পথে উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ মোগল-সৈন্য পাহাড়ের আড়াল থেকে 'আল্লা হো আকবর' শব্দে তাঁর সৈন্যদের উপর লাফিয়ে পড়লো। রাঠোর-সৈন্যেরা তাদের রাজকুমারকে রক্ষা করবার জন্য তলোয়ার খুলে মোগলদের বাধা দিলো। দুই দলে তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগলো।

যুদ্ধ যখন খুব ভীষণভবে চলছে, সেইসময় কয়েকজন বিশ্বাসী সৈন্যের সঙ্গে অজিৎসিংহ পাহাড়ের অন্য পথ ধ'রে মোগলদের চোখে ধুলো দিয়ে উদয়পুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাজসিংহ পরম সমাদরে অজিৎসিংহকে অভ্যর্থনা ক'রে কৈলবা গ্রামে তাঁর থাকবার জায়গার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন।

রাজসিংহ সাহায্য না করলে অজিৎসিংহ কিছুতেই পালাতে পারতেন না, নিশ্চয়ই ধরা পড়তেন, আওরঙ্গজেব এটা বেশ বুঝতে পারলেন, পেরেও মনের আগুন মনেই চেপে রেখে চুপ ক'রে রইলেন। রাজসিংহ কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকলেন না, একদিন এইসব আপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আওরঙ্গজেবের রাগের আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে, এটা বুঝেই রাজসিংহ তৈরী হতে লাগলেন।

ছয়

আওরঙ্গজেব হিন্দুদের মোটেই দেখতে পারতেন না, হিন্দুধর্মের উপর তাঁর কেমন একটা তীব্র বিদ্বেষ ছিল। তিনি নানারকমে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতেন। অনেকদিন থেকে তিনি হিন্দুদের উপর একটা খাজনা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন, সেটার নাম হচ্ছে 'জিজিয়া', বা 'মুণ্ডকর'। এ-খাজনা মুসলমানদের দিতে হতো না, কেবল প্রত্যেক হিন্দুকেই মাথা-পিছু এ-খাজনা দিতে হতো।

মহারাজ যশোবন্তসিংহ বেঁচে থাকতে সম্রাট্ আওরঙ্গজেব এ-অন্যায় খাজনা আদায় করতে পারেন নি, তিনি ঘোর আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু এবার আওরঙ্গজেবের সে পথের কাঁটা আর নাই, তাই তিনি রাজ্যময় ঘোষণা ক'রে দিলেন, প্রত্যেক হিন্দুকেই 'জিজিয়া' কর দিতে হবে।

হিন্দুদের মধ্যে হাহাকার প'ড়ে গেল। কিন্তু তারা জানতো প্রতিবাদ করা বৃথা! বরং বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশ পেলেই সম্রাট্ তা নিষ্ঠুর হস্তে দমন করবেন। কাজেই তারা সম্রাটের আদেশ হতাশভাবেই মেনে নিলে।

রাণা রাজসিংহ স্বজাতির এই দুর্দশা দেখে প্রাণে বড় ব্যথা পেলেন। আওরঙ্গজেবের এই অন্যায় অত্যাচার দমনের উপায় কি, সেই কথাই তিনি দিনরাত ভাবতে লাগলেন। রাজসিংহের মনে কেবলই এ-কথা উঠতে লাগলো,—এই বিরাট ভারতবর্ষে এখনো তো কত হিন্দু রাজা রয়েছেন, কেউ কি সম্রাটের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন না? সবাই কি বুকের সাহস ও বাহুর শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন? হিন্দুদের কি তবে এম্‌নি ক'রে চিরদিন চোখের জল ফেলতে-ফেলতে অন্যায় অত্যাচার মাথা পেতে নীরবে সয়ে থাকতে হবে?

তিনি এই খাজনা তুলে নিতে খুব মিঠে-কড়া ভাষায় আওরঙ্গজেবকে

একখানা চিঠি লিখলেন। চিঠিটি বেশ বড়। চিঠির শুরুতে রাজসিংহ সম্রাটের প্রতি যথোচিত বিনয় প্রকাশ করে লিখেছেন : আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। শুনতে পাই যে, আমার মতন একজন হিতাকাঙ্ক্ষীকে দমন করার জন্য আপনার প্রচুর অর্থক্ষতি হয়েছে এবং সেই ক্ষতিপূরণের জন্য ও আপনার শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করার জন্য আপনি এক বিশেষ খাজনা আদায়ের আদেশ দিয়েছেন।

আপনার মহানুভব পূর্বপুরুষ সম্রাট মহম্মদ জালালউদ্দিন আকবর বাহান্ন বৎসর ধরে সমতার ভিত্তিতে সাম্রাজ্য শাসন করেছেন এবং সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বজায় রেখেছেন। যীশু অথবা মোজেস অথবা মহম্মদের অনুগামিগণ অথবা ব্রাহ্মণগণ সকলেই সমানভাবে তাঁর কৃপালাভ করেছিলেন।

সম্রাট মহম্মদ নুরউদ্দিন জাহাঙ্গীরের বাইশ বৎসরকাল রাজত্বের সময়েও তাঁর সমস্ত প্রজাই সমভাবে রাজকীয় আশ্রয় লাভ করেছিল। তাঁর মিত্রদের তিনি বিশ্বাসভাজন ছিলেন এবং সমরাভিযানে কৃতকার্য হয়েছিলেন।

শাহ্‌জাহানের বত্রিশ বৎসরকালের শাসনও কম গৌরবোজ্জ্বল ছিল না। তিনি অক্ষয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন।

আপনার পূর্বপুরুষগণ প্রজাপুঞ্জের কল্যাণের প্রতি এই রকম আগ্রহেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। এই মহৎ ও উদার নীতি অনুসরণের ফলে যখনই এবং যেদিকেই তাঁরা পদক্ষেপ করেছেন, তখনই জয় ও সমৃদ্ধি তাঁদের বরণ করেছে; বহু জনপদ ও দুর্গ তাঁদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছে।

আপনার শাসনকালে কিন্তু প্রজাগণ পদতলে পিষ্ট হচ্ছে। সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রদেশকে দৈন্যদশায় উপনীত করা হয়েছে। বহু অঞ্চল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং আরও অঞ্চল নিশ্চিতই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ সাম্রাজ্যের সর্বত্র ধ্বংস ও লুণ্ঠন অবাধ

গতিতে বিরাজ করছে। জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, দিনের পরের দিন অসহনীয় ও জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। সম্রাটের ঘরেই যখন অভাব দেখা দিয়েছে তখন আমীর ওমরাহদের অবস্থা কি হতে পারে ? সৈনিকদের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে, ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছেন, মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট, হিন্দুরা সর্বস্বান্ত এবং সর্বত্র হাহাকার।

এই হৃতসর্বস্ব প্রজাপুঞ্জের কাছ থেকে গুরুভার খাজনা জোর করে আদায়ের পর সম্রাটের মহিমা কীভাবে বজায় রাখা যাবে ? সাম্রাজ্যের সংকটকালে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সর্বত্র বলা হচ্ছে যে, হতভাগ্য হিন্দুদের প্রতি আক্রোশবশতঃ হিন্দুস্থানের সম্রাট ব্রাহ্মণ, যোগী, বৈরাগী, সন্ন্যাসী সকলের কাছ থেকে কর আদায় করবেন। তৈমুর বংশের সম্মানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি একান্তবাসী নিরীহ সন্ন্যাসীদের উপরও তাঁর শক্তি প্রয়োগে উদ্যত হয়েছেন। যদি মহামান্য সম্রাট ধর্মশাস্ত্রের উপর বিন্দুমাত্র আস্থা রাখেন, তবে সেইসব শাস্ত্র থেকে তিনি এই নির্দেশই পাবেন যে, সৃষ্টিকর্তা সকলেরই সৃষ্টিকর্তা—কেবলমাত্র মুসলমানদের নয়। সৃষ্টিকর্তার নিকট মুসলমান ও অমুসলমান সকলেই সমান। তিনিই সকলের অস্তিত্বের কারণ। আপনার মসজিদগুলিতে তাঁর উদ্দেশেই নমাজ পাঠ করা হয়। মূর্তিশোভিত মন্দিরগুলিতেও, যেখানে ঘন্টাধ্বনি হয়, সেখানে তাঁকেই উপাসনা করা হয়। অন্য লোকের ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানকে অপমান করলে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকেই অপমান করা হয়। আমরা যখন কোন চিত্রের সৌন্দর্যহানি করি, তখন স্বভাবতই আমরা চিত্রকরের বিরাগভাজন হই।

পরিশেষে এই কথা জানাই যে, হিন্দুদের কাছ থেকে আপনি যে কর আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা ন্যায়নীতি বিরোধী। এই কর হিন্দু আইনের শর্তও লঙ্ঘন করে। তথাপি আপনার নিজস্ব ধর্মচিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি একান্তই আপনি এই কর আদায়করতে চান তবে আপনার হিতাকাঙ্ক্ষীদের নিকট হতেই প্রথমে কর আদায় করবেন।

সামান্য পিঁপড়া বা মাছিদের বিব্রত করা আপনার বদান্য মনের উপযুক্ত হবে না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, আপনার সরকারের মন্ত্রীরা ন্যায়পরায়ণতা ও সুনীতি সম্বন্ধে আপনাকে অবহিত না করে কীভাবে কর্তব্যকর্মে অবহেলা করছেন!

আওরঙ্গজেব সে চিঠি পেয়ে আর রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। রাণা রাজসিংহ মোগলের অধীন রাজা হ'য়ে বারবার এম্‌নি ক'রে সম্রাটের কাজে বাধা দেবেন, এ আর কতকাল সহ্য ক'রে থাকা যায়,—বিশেষ ক'রে আওরঙ্গজেবের মত লোকের পক্ষে! তিনি এবার রাণাকে উচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন। রাজসিংহের রাজ্য একেবারে ছারখারে দেওয়াই তাঁর ইচ্ছা।

তিনি তাঁর রাজ্যের প্রধান সেনাপতিকে ডেকে বললেন,—"আমার রাজ্যে যেখানে যত সৈন্য, সেনাপতি ও সামন্ত-রাজা আছে, তাদের সবাইকে ডাকো; এমন একটা বিরাট সৈন্যদল গ'ড়ে তোলো, যেন কেউ তাদের পরাস্ত করতে না পারে।"

তাই হলো। ভারতবর্ষের যেখানে যত মোগল-সৈন্য ছিল, তা একত্র ক'রে এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল তৈরী হলো। তার উপর আবার কাবুল থেকে রাজকুমার আজিম, বাংলা থেকে রাজকুমার আকবর এলেন।

তখন মারহাট্টা রাজ্যে রাজা শিবাজীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছিলো, সে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ মৌজাম; রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ব'লে, শিবাজীর সঙ্গে যুদ্ধ থামিয়ে আওরঙ্গজেব মৌজামকে সমস্ত সৈন্য নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হুকুম করলেন। এই ক'রে আওরঙ্গজেব যে প্রকাণ্ড সৈন্যদল গড়লেন, তাই দেখে লোকে মনে করলো সম্রাট্ হয়তো পৃথিবীর অন্য কোন একটা বড় রাজার রাজ্য জয় করতে যাচ্ছেন! রাণা রাজসিংহের মত একজন সহায়-সম্বলহীন রাজপুত-রাজার বিরুদ্ধে যে এত বড় একটা আয়োজনের আবশ্যক—তা কেউ বুঝতে পারেনি।

আওরঙ্গজেব নিজে এই সৈন্য নিয়ে মেবারের দিকে যাত্রা করলেন। মোগল-সৈন্যের পদভরে সারা পৃথিবী কেঁপে উঠলো—তাদের জয়ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত ও প্রতিধ্বনিত হলো।

রাণা রাজসিংহ সমস্তই শুনলেন; অমনি তাঁর বীরহৃদয় নেচে উঠলো যুদ্ধের জন্য,—জননী জন্মভূমির সম্মান রক্ষার জন্য তাঁর অধীনে যত সামন্তরাজ ও সর্দার ছিলেন, তাঁরা সবাই সৈন্য নিয়ে রাজসিংহকে সাহায্য ক'রে, মেবারকে মোগলের গ্রাস থেকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে এলেন।

রাজসিংহ দেখলেন, মোগলের সৈন্যের কাছে তাঁর সৈন্য অতি সামান্য, এই সামান্য সৈন্য নিয়ে মোগলের গতিরোধ করা অসম্ভব। তাই তিনি আরাবল্লী-পর্বতশ্রেণীর গোপন জায়গায়—যেখানে মোগল যেতে পারে না,—সেখানে কতকগুলো ক'রে সৈন্য রেখে দিলেন; তা ছাড়া প্রজাদের হুকুম করলেন, মেবারের সমতলভূমি ছেড়ে সবাইকে পাহাড়ে বনে গিয়ে আশ্রয় নিতে। রাজভক্ত প্রজারা স্বদেশের মঙ্গলের জন্য রাজার আদেশ মাথা পেতে নিয়ে, দেশ ছেড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে বাস করতে লাগলো। মেবার জনশূন্য হয়ে প'ড়ে রইলো।

বিপুল সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আওরঙ্গজেব এসে দেখলেন, মেবারের গ্রাম, পথঘাট একেবারে জনমানবহীন; কেউ তাঁকে বাধা দেবার নেই। কাজেই তিনি বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে সমস্ত দেশ দখল ক'রে নিতে লাগলেন।

তিনি চিতোর, গড়মণ্ডল জীবণ মুণ্ডিসার ইত্যাদি দুর্গগুলো একে একে জয় ক'রে নিলেন। তারপর সেগুলো রক্ষার জন্য সে-সব জায়গায় মোগল সৈন্য রেখে দিলেন। এইভাবে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ক'রে তিনি এরপর রাণা রাজসিংহের সন্ধানে প্রকাণ্ড একদল সৈন্য নিয়ে ধীরে ধীরে আরাবল্লী-পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলেন।

সাত

দু'ধারে উঁচু পাহাড়, মাঝখানে সঙ্কীর্ণ পথ; এইরকম পথকে গিরিবর্ত্ম বলে। আরাবল্লী-পাহাড়ে এরকম গিরিবর্ত্মের অভাব নাই। রাণা রাজসিংহ সৈন্যদলকে তিন ভাগে ভাগ ক'রে, স্বয়ং একভাগ নিয়ে 'নাইন' নামক গিরিবর্ত্মের মধ্যে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের অপেক্ষায় ঘাঁটি দিয়ে রইলেন।

বাকী দু'ভাগের একভাগ রাজকুমার জয়সিংহের অধীনে আরাবল্লীর উত্তরদিকে পাঠিয়ে দিলেন; আর একভাগ রাজকুমার ভীমসিংহের অধীনে পশ্চিমদিকে রেখে দিলেন,—যেন তিনদিক্ থেকেই মোগলদের চেপে ধরতে পারেন। এমন ব্যবস্থাই তিনি করলেন যে, এ-যাত্রা যদি সম্রাট্ আওরঙ্গজেব নাইন-গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করেন, তবে আর তাঁকে একটি সৈন্য নিয়েও ফিরে যেতে হবে না।

কিন্তু সম্রাটের বড় সৌভাগ্য যে, তিনি নাইন-গিরিবর্ত্মে না গিয়ে তার পাশের একটা বড় চওড়া রাস্তা ধ'রে ভীলদের দোবারী নামে একটি গ্রামে গিয়ে ছাউনি করলেন। রাজকুমার আকবর প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করতে গিয়ে দেখেন, সেখানে জনমানবের সাড়া নাই, রাজধানী শ্মশানের মত শূন্য প'ড়ে আছে। তিনি নিশ্চিন্তমনে সেখানে তাঁবু ফেলে দিন কাটাতে লাগলেন।

একদিন তাঁর সৈন্যেরা আমোদ-আহ্লাদ করছে, কেউ-বা নামাজ পড়ছে, কেউ-বা সতরঞ্চ খেলছে, কেউ-বা ঘুমুচ্ছে—এমন সময় হঠাৎ 'হর-হর বম্-বম্' শব্দে তাদের বুক কেঁপে উঠলো। রাজকুমার জয়সিংহ তাঁর সৈন্যদল নিয়ে একেবারে আকবরের সৈন্যদলের উপর লাফিয়ে পড়লেন।

মোগল সৈন্যেরা আর পালাতে পথ পেলে না। যেদিকে পালাতে চায়, সেইদিকেই দেখে রাজপুত সৈন্যের শাণিত বর্শা তাদের রক্তপানের

জন্য যেন শত শত চক্‌মকে জিহ্বা বাড়িয়ে রয়েছে! আকবরের সৈন্যের প্রায় সমস্তই সেইদিন রাজপুতদের বর্শা ও তলোয়ারের নীচে প্রাণ দিলে।

আকবর সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে পিতা আওরঙ্গজেবের সাহায্য পাওয়ার আশায় একটি গিরিবর্ত্ম দিয়ে সেই দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ সুমুখে রাজসিংহের একদল সৈন্য তাঁকে আক্রমণ করায় তিনি অন্য-পথ দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়ে পড়লো। তিনি চারদিকে পাহাড়-ঘেরা এমন একটি জায়গায় গিয়ে পড়লেন, যেখানে ডানে-বাঁয়ে উপরে-নীচে কেবল ভীল ও রাজপুত-সৈন্য। তারা চারদিক্ থেকে মোগল-সৈন্যদের ওপর তীর বর্শা এবং বড়-বড় পাথর ফেলতে লাগলো। ওদিকে আবার জয়সিংহ সৈন্য নিয়ে পেছন দিক্ থেকে এসে আকবরকে আক্রমণ করলেন।

আকবরের বিপদের অন্ত নাই। তিনি কয়েকদিন সেই জায়গায় কাটালেন, কিন্তু ক্রমেই তাঁর দুর্দশা চরমে উঠতে লাগলো। সঙ্গে যে রসদ ছিল তা ফুরিয়ে গেল, ঝরণা বা নদী থেকে জল আনবেন তাও রাজপুত ও ভীল-সৈন্যদের ভয়ে পারছেন না। এম্‌নি ক'রে খাদ্য ও জলের অভাবে আর ক'দিন চলে?

শেষে আর আত্মরক্ষার উপায় না দেখে আকবর জয়সিংহের কাছে এই ব'লে অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন যে, যদি তিনি এবার তাঁকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেন, তবে তিনি পিতা আওরঙ্গজেবকে ব'লে-ক'য়ে মেবার থেকে মোগল সৈন্য তুলে নিয়ে যাবেন, আর মোগলেরা মেবার আক্রমণ করবে না।

আকবরের করুণ প্রার্থনায় জয়সিংহ একেবারে গ'লে জল হয়ে গেলেন। তিনি যে শুধু তাঁকে সেই গিরিবর্ত্ম থেকে মুক্তি দিলেন তা নয়, যাতে কোনো রাজপুত সৈন্য তাঁর কোনো অনিষ্ট করতে না পারে, —যাতে তিনি নির্বিঘ্নে ফিরে যেতে পারেন, সেজন্য কতকগুলো রাজপুত

সৈন্য তাঁর সঙ্গে দিয়ে দিলেন। তারা তাঁকে পথ দেখিয়ে চিতোর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলো।

আট

সেনাপতি দিলির খাঁ ছুটে আসছিলেন রাজকুমার আকবরকে সাহায্য করবার জন্য; কিন্তু তিনিও এক গিরিবর্ত্মের মধ্যে আটকে পড়লেন। রাজপুত-সৈন্যেরা সেখানে তাঁকে ঘিরে ফেললে। সেই যুদ্ধে দিলির খাঁ নিহত হলেন এবং মোগলদের অনেক জিনিসপত্র রাজপুতদের হাতে পড়লো।

আওরঙ্গজেব মনে করেছিলেন, আকবর এবং দিলির খাঁ নিশ্চয়ই যুদ্ধে রাজপুতদের হারিয়ে দেবেন। এই আশায় মুগ্ধ হ'য়ে তিনি দোবারী গ্রামে নিশ্চিন্ত মনে বসেছিলেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁর সে আশাভরসা শূন্যে মিলিয়ে গেল। আকবর ও দিলির খাঁর পরাজয়ের সংবাদ আওরঙ্গজেবের কাছে এসে পৌঁছুতেই রাণা রাজসিংহ হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতন একদল সৈন্য নিয়ে এসে তাঁকেও আক্রমণ করলেন।

মোগলে রাজপুতে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো। মোগলের কামান গুড়ুম! গুড়ুম! শব্দে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চারদিকে আগুন ছড়াতে সুরু করলে। সে গোলার ঘায়ে শত-শত রাজপুত জীবন দিতে লাগলো, কিন্তু তবু তারা ভয় পেলো না।

রাজপুতেরা মোগলদের কামানের উপর লাফিয়ে প'ড়ে তলোয়ারের ঘায়ে খণ্ড-খণ্ড ক'রে, ফিরিঙ্গী গোলন্দাজদের কামান কেড়ে নিলে। রাজপুত সৈন্য এবার সিংহের মত ক্ষেপে উঠলো···মোগলেরা তখন আর পেরে উঠলো না, ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে পালাতে আরম্ভ করলে; কিন্তু অনেককেই রাজপুতদের হাতে জীবন দিতে হলো। ব্যাপার গুরুতর দেখে আওরঙ্গজেব পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

আরও কয়েকটা যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের ছেলে এবং সেনাপতিরা রাজপুতদের কাছে হেরে গেলেন। কিন্তু এ পরাজয়ের অপমানেও আওরঙ্গজেব ক্ষান্ত হলেন না। তিনি আবার মহারাজ যশোবন্ত সিংহের রাজ্য গ্রাস করবার জন্য সৈন্য পাঠালেন।

যশোবন্ত সিংহের বিধবা মহারাণী, রাণা রাজসিংহের সাহায্য চাইলেন। রাণা, রাজকুমার ভীমসিংহকে একদল সৈন্য দিয়ে যশোবন্ত সিংহের নাবালক পুত্রের রাজ্য রক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

এবার যুদ্ধজয়ের কৌশলটা ভারী চমৎকার! দিনে ঘোর যুদ্ধ হয়, রাত্রে সৈন্যেরা বিশ্রাম করে। একদিন রাত্রে মোগল সৈন্যেরা বিশ্রাম করছে, এমন সময় একজন রাজপুতসর্দার মোগলদের প্রায় পাঁচশো উট ধ'রে এনে প্রত্যেকটা উটের পিঠে এক একটা মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে মোগলদের ছাউনির মধ্যে ছেড়ে দিয়ে এলো।

গভীর রাত···ছম্‌ছমে অন্ধকার! মোগলরা সেই মশালের আগুন চারদিকে ছুটোছুটি করতে দেখে, ভয়ে যে যে-দিকে পারলে, পালাতে লাগলো। আর রাজপুতেরা একধার থেকে তলোয়ারের ঘায়ে সব সাবাড় ক'রে দিতে আরম্ভ করলে। সেই যুদ্ধে আর মোগলেরা জিততে পারলে না। রাণা রাজসিংহকে শাস্তি দেওয়ার সমস্ত কৌশলই আওরঙ্গজেবের ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

নয়

আওরঙ্গজেব যেমন বৃদ্ধ পিতা সাজাহানকে কারাগারে বন্দী ক'রে নিজে রাজসিংহাসন লাভ করেছিলেন, এইবার তাঁর পুত্র আকবরও পিতার সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। তিনি রাজপুত রাজাদের সাহায্যে পিতাকে রাজ্যচ্যুত ক'রে স্বয়ং ভারত সম্রাট্ হওয়ার জন্য বেশ একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুললেন। এমন কি, সিংহাসন গ্রহণের দিন পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেল। এক দৈবজ্ঞ এসে একটা বেশ শুভদিন দেখে দিয়ে গেল।

রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন তৈরী, এমন সময় সেই দৈবজ্ঞ

গিয়ে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কাছে সমস্ত চক্রান্ত প্রকাশ ক'রে দিলে। আরওঙ্গজেব শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন।

আওরঙ্গজেব চিরকালই অত্যন্ত কৌশলী। তিনি এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাড়াতাড়ি এক ফিকির বার করলেন। তিনি পুত্র আকবরের নামে একখানা চিঠি লিখে রাঠোর-বীর দুর্গাদাসের শিবিরে গুপ্তচর দিয়ে সেখানা ফেলে রেখে এলেন। দুর্গাদাস ছিলেন আওরঙ্গজেবকে রাজ্যচ্যুত করবার ষড়যন্ত্রের নেতা।

চিঠিতে লেখা ছিল,—"প্রিয় পুত্র আকবর, তুমি রাজপুতদের সমূলে বিনষ্ট করবার যে কৌশল ক'রেছ, এতে আমি ভারী খুসী হ'য়েছি। সাবধান, তারা যেন এর বিন্দুবিসর্গও জানতে না পারে। তারা যখন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে, তখন তুমি তাদের আক্রমণ ক'রে একেবারে ধ্বংস ক'রে দেবে। তাহ'লে আর তারা কোনদিন মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না।

চিঠিখানা দুর্গাদাসের হাতে পড়লো। তিনি চিঠি প'ড়ে আকবরের উপর রাগে জ্বলে উঠলেন। এ যে আওরঙ্গজেবের চক্রান্ত, তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

রাজপুতেরা আর আকবরকে সাহায্য করলে না, সকলেই স'রে দাঁড়ালো। আকবর তার কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না, তিনি মহা বিপদে পড়লেন। আওরঙ্গজেব এর মধ্যে তাঁর আর-সব পুত্রদের ডেকে পাঠালেন, তাঁরা নিজ-নিজ সৈন্য নিয়ে পিতার সাহায্যের জন্য ছুটে এলো। তাঁদের পেয়ে আওরঙ্গজেবের ভরসা হলো।

আকবরের বিপদ এবার দু'দিকেই, তিনি না পারেন পিতার কাছে যেতে, না পারেন রাজপুতদের সাহায্য চাইতে। শেষে রাজপুতেরা বুঝতে পারলো,—এটা আওরঙ্গজেবের চক্রান্ত, এতে আকবরের দোষ কিছু নাই। তখন তারা আকবরকে আশ্রয় দিলে। কিন্তু যে-সুযোগ চলে গেছে, তা আর পাওয়া গেল না।



তিনি চিঠি প'ড়ে জ্বলে উঠলেন।

আকবর কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, সর্বদাই তাঁর মনে একটা আতঙ্ক! তিনি যেখানেই যান, সেখানেই যেন পিতার সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি তাঁর দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে চেয়ে থাকে! কোথাও তাঁর মনে শান্তি নেই। শেষে তিনি দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে পিতার ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষার ইচ্ছা করলেন।

দুর্গাদাস তাঁর অনুরোধে তাঁকে কতকগুলি সৈন্য দিয়ে গোপনে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আকবর কিন্তু সেখানে গিয়েও মনের শান্তিতে থাকতে পারলেন না। কিছুদিন পরে ইংরেজদের একখানি জাহাজে চ'ড়ে তিনি পারস্যে চলে গেলেন।

আকবর আবার রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এই কথা শুনে আওরঙ্গজেব একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝেছিলেন, রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে মোগলেরা সহজে পেরে উঠবে না, তাই আর যুদ্ধযাত্রা ক'রে বিশেষ লাভ নাই। তিনি রাজপুতদের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছা করলেন।

কিন্তু প্রকাশ্যে সন্ধির প্রস্তাব ক'রে পাঠানো মোগল-সম্রাটের পক্ষে একটা দারুণ অপমান, তাতে রাজপুতেরা হয়তো অভিমানে ফেঁপে উঠবে। এই মনে ক'রে আওরঙ্গজেব শ্যামসিংহ নামক একজন রাজপুতের দ্বারা কৌশলে রাণা রাজসিংহের কাছে সন্ধির প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন।

সন্ধির কথাবার্তা হতে-হতেই বৃদ্ধ রাজসিংহ পরলোকে যাত্রা করলেন। সারাজীবন তিনি যুদ্ধেই কাটিয়েছেন। যুদ্ধের ফলে তাঁর সারা গায়ে যে ক্ষত হয়েছিল, তাই শেষে ভীষণ হয়ে দাঁড়ালো। বীর রাজসিংহ যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন অঙ্গে নিয়েই স্বর্গে চলে গেলেন।

সমাপ্ত